

সমসংখ্যক

জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর

বাংলাদেশ নামক আমাদের একটুখানি ভূখণ্ডে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস। এ সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আশির দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩-এর বেশি ছিল। তখন সবাই আতঙ্কে ছিল। ওই হারে বাড়তে থাকলে ২৩ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে; এত লোকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ সব ধরনের চাহিদা মেটানোর বিষয়টি সবাইকে দুর্ভাবনায় ফেলেছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তখন বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসংখ্যা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কার্যক্রম থেকে সুফল পাওয়া গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। মানুষের সচেতনতা বেড়েছে, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। তবে আশির দশকের জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়ে ২০১৬ সালে ১৬ কোটি অতিক্রম করেছে। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে বলে সবাই যতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল; দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার পরও তেমন কিছু ঘটেনি। বরং উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের কাতারে পৌঁছে গেছে। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে ২০২১-এর আগেই মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১-এর অনেক আগেই উন্নত বিশ্বের তালিকায় নাম উঠে যাবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মধ্যম আয় বা উন্নত দেশে পরিণত হলেই চলবে না; সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে বিদ্যমান ধনী-গরিবের মধ্যকার বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে নিশ্চিত করে একটি কথা বলা যায় যে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারের সন্তান সংখ্যা নিরক্ষর পরিবারের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কম। উন্নয়নেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবদান অনেক বেশি। অদক্ষ জনগণ একটি দেশের বোঝা। পক্ষান্তরে দক্ষ জনগণ দেশের সম্পদ, যা মানবসম্পদ নামে পরিচিত। পরিকল্পিত উপায়ে জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা গেলে অগ্রতিরোধ্য গতিতে দেশ এগিয়ে যাবে। জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরের প্রধান উপায় শিক্ষা। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রক্রিয়া। সঠিক অর্থে শিক্ষা বলতে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার সুষম বিকাশ বোঝায়। নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন, জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক মানবসম্পদ তৈরিই শিক্ষার লক্ষ্য। এ শিক্ষার মাধ্যমেই জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তর সম্ভব। অবশ্যই শিক্ষা হতে হবে মানসম্মত। আমাদের সামাজিক বেশ কিছু ধারণা বদ্ধমূলভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর

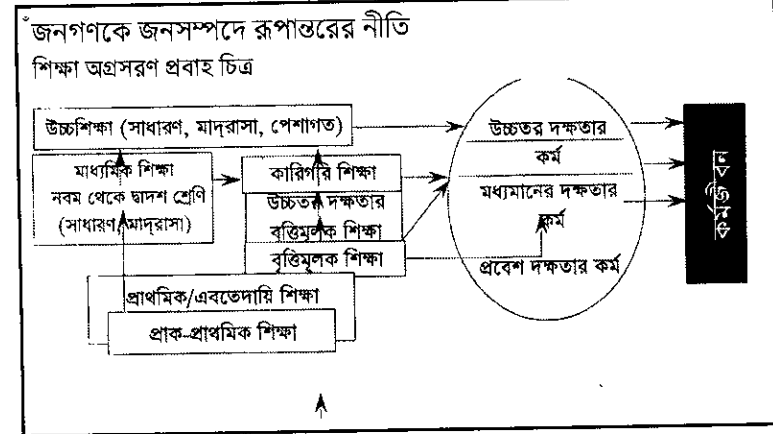
শিক্ষা | ড. হিদ্দিকুর রহমান



অধ্যাপক (অব.) ও প্রাক্তন পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। প্রধান দুটি ভুল ধারণার একটি হচ্ছে- 'সবাই শিক্ষিত হলে জমি চাষ করবে কে, ড্রেন-রাস্তাঘাট পরিষ্কার করবে কে, বাস চালাবে কে বা কুলি-মজুরের কাজ করবে কে? অতএব সবার জন্য শিক্ষা নয়।' আরেকটি হচ্ছে 'স্কুল-কলেজে পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ভালো চাকরি করা।' এসব ভুল ধারণা আমাদের ভাঙতে হবে। এসব ধারণা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। আজকের শিশু-কিশোর সবাইকে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা শেষে

শিক্ষা আরম্ভের পূর্বের যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণী থেকে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা, এ শিক্ষা শিক্ষার সব ধারায় অভিন্ন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজি ধারায় একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা



মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন ধারা ও ধরনের শিক্ষা নেবে। অনেকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধারার উচ্চশিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা হবে নির্দিষ্ট বয়সের সব বালক-বালিকার জন্য অভিন্ন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক গুণাবলি, টেকসই এবং জীবন দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। মৌলিক শিক্ষাই হবে জীবনের এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে শিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম জনগণকে মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে চিত্র অনুসারে শিক্ষা অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র অনুসরণ করা হয়েছে:

'প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী', যাদের পিতা-মাতা নিরক্ষর এবং যারা বাড়িতে ও সামাজিক পরিবেশে সুযোগের অভাবে আনুষ্ঠানিক

শেষে মেধা ও প্রবণতা অনুসারে এক দল শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যাবে, অন্যরা যাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষায়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কেউ কেউ কারিগরি শিক্ষায় যাবে; অন্যরা উচ্চশিক্ষায়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে উচ্চতর দক্ষতার বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চতর দক্ষতার বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে কারিগরি শিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ থাকবে। আবার সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশও করতে পারবে। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা শেষে পেশাগত উচ্চশিক্ষায় যেতে পারবে। এ নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে একদিকে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমবে, অন্যদিকে দক্ষ আত্মকর্মসংস্থানকারীর সংখ্যা বাড়বে।

এখন কথা হচ্ছে, নীতি প্রণয়ন করলেই বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে না। এ জন্য প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষাধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করা। নিজের কাজ নিজে করা, প্রমূলক কাজে আগ্রহী হওয়া, শ্রমিকের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল হওয়া- সর্বোপরি ছোট-বড় সব ধরনের কাজই মর্যাদাপূর্ণ, যদি তা সততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব ধারণা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ করার দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১৩ সালে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' এবং নবম-দশম শ্রেণীতে 'ক্যারিয়ার শিক্ষা' চালু করা হয়েছে। সফলতার সঙ্গে বিষয়গুলো শ্রেণীকক্ষে পরিচালিত হলে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাধারায় শিক্ষালাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষালাভের সুযোগও কর্তৃপক্ষকে সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা যখন মানসম্মত আট বছর মেয়াদি মৌলিক শিক্ষা-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে রাস্তাঘাট ও নদমা পরিষ্কারের কাজ করবে, তখন একদিকে জনগণ উন্নতমানের সেবা পাবে, অপরদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে (অ্যাপ্রোন, গ্লাভস, পরিষ্কার করার যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ব্যবহার করে) কাজ সম্পাদন করবে। এতে তাদেরও স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকবে না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক উন্নত পদ্ধতিতে অধিক ফসল ফলাতে সক্ষম হবে, বাস-ড্রাইভার ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাবে। ফলে দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। এতে একদিকে দক্ষ সেবাদানকারীর আয় বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে এবং ব্যক্তি-পরিবার ও দেশ সমৃদ্ধ হবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে এ শিক্ষা সম্প্রসারকীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজের স্বরূপ অনুসারে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ থেকে ব্যাংকের মুনাফার হার যথাসম্ভব কম হতে হবে। তবে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ সঠিক কাজে লাগানো হচ্ছে কি-না তা নিয়মিত তদারক বা পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষ কথা হচ্ছে, বর্তমানে আমরা জনমিতি পিরামিড পরিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে পৌঁছেছি। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বয়স ২৪ বছরের কম। শিক্ষার মাধ্যমে এ বিশাল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করা গেলে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জনসংখ্যা কাঠামোতে-পিরামিডে এ সুযোগ বারবার আসে না। এ সুযোগের যথার্থ ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করে জাতীয় উন্নয়ন। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়, উৎপাদন ও জনসেবার মান বাড়বে। বিদেশে দক্ষ মানবসম্পদ পাঠিয়ে অনেক বেশি 'রেমিট্যান্স' পাওয়া যাবে। এসব ব্যবস্থা থেকে কাক্ষিত ফল পেতে হলে অবশ্যই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ধনী-গরিবের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমাতে হবে।